মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়

নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর

শহীদ ইদ্রিস আলী ও আমিরজান বেওয়া স্মৃতি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা (দৃষ্টিপাত প্রদত্ত অর্থায়ন থেকে প্রদত্ত বৃত্তি)

দশম শ্রেণী

শহীদ ইদ্রিস আলীর পরিবারে মোট এগারজন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে চার ভাই এবং পাঁচ বোন ছিল। তার পিতার নাম ছিল আব্বাস আলী সরকার। তাদের পরিবারটা খুব সুখ শান্তিতে ভরপুর ছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কালবৈশাখী ঝড় এলো যে ঝড়ে পরিবারের অধিকাংশ লোক মারা গেল। পৃথিবীতে শুধু বেঁচে রইল অশ্রুসজল আমিরজান বেওয়া এবং ছয় সন্তান। এদের মধ্যে তিন ভাই, তিন বোন। ইদ্রিস মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করল। দেশে বেধে গেল তুমুল সংগ্রাম। একদিন খবর এলো সকালে গাছের একটি পাতাও থাকবে না। এই ভয়ে ইদ্রিসের পরিবার নিজ গ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করল। এদিকে ইদ্রিস তুরা পাহাড়ে ট্রেনিং করতে গেল। ট্রেনিং শেষে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল প্রায় দীর্ঘ ৮ মাস, ইদ্রিস তেলিখালি ক্যাম্পের লড়াইয়ে পাঞ্জাবীদের হাতে নভেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

আব্বাস আলী সরকার ভারতে যাওয়ার জন্য তার পরিবারের সকলকে নিয়ে ভোগাই নদীর কাছে একটি বাংকারেই রইল, তারপর তার ছেলে (৬) কামালকে নিয়ে একটু বাইরে থেকে ঘুরে এল। তারপর ভোগাই নদী পার হবার জন্য প্রস্তুত হল তারা। পিতার পিঠে ছিল এক মেয়ে, ডান হাতে আরেক মেয়ে এবং বাম হাতের সাথে ছিল আমিরজান বেওয়া। তারা যখন নদীর মাঝখানে আসল তখনি একটি গুলি এসে লাগল আব্বাস আলী সরকারের মাথার উপর। সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলিটা খসে নদীর স্রোতের সাথে ভেসে গেল। কাঁধে চড়া মেয়েটাও পানিতে পড়ে গেল এবং আরেক মেয়ের বুকের ভিতর গুলি লাগল, কিন্তু সে অজ্ঞান হলো না। চোখের সামনে এমন করে যে মানুষ মারা যায় তা আমিরজান বেওয়া কোনোদিন প্রত্যক্ষ করতে পারেনি স্বামী-মেয়ে মারা যাওয়ার আগে। আমিরজান বেওয়া মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারল না, শুধু চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা শুরু করল। এমন আঘাত কেউ সহ্য করতে পারবে না, যে আঘাত সহ্য করেছে আমিরজান বেওয়া। তারপর বুকে আঘাত করা মেয়েটাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বুক থেকে গুলি বের করার সাথে সাথে সেও মারা গেল। বাবা আর বোনের মৃত্যুর কথা শুনে ইদ্রিস পাগলের মতো হয়ে গেল, বলল আমি বেঁচে থাকতে আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমি এ জীবন রাখব না। সবাই মারা যাওয়ার পর তাদের জীবন কিভাবে কাটে? তাদের জীবন কাটে খুব দুঃখ কষ্ট করে, যে দুঃখের সীমা নেই। আমিরজান বেওয়ার ছেলেমেয়েরা যখন ভাতের জন্য কান্না শুরু করে ঠিক তখনি আমিরজান বেওয়ার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে। ভাত দিতে না পেরে অন্যের কাছ থেকে ভাতের ফেন এনে দিয়েছিল। তারা বলে, মা ভাত দাও, এগুলো খাব না। কাঁদতে কাঁদতে আমিরজান বেওয়ার চোখের ভেতর ঘা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তার আঁখিতে জল ছিল না। একদিন তাবুর ভিতরে তারা রাতযাপনের জন্য গিয়েছিল, তাদের পাশের তাবুতে লোকেরা খাসি জবাই করে রান্না করছিল। তখন তার ছোট মেয়ে বলল, মা আমার অনেক ক্ষিদে লেগেছে, ওদের কাছ থেকে একটু মাংসের তরকারি এনে দেবে। তার মা লজ্জায় আর চাইল না। এমন কথা শুনলে কার চোখ দিয়ে জল না ঝড়বে। সেই পরিবারের সদস্য আমার মা, কিন্তু তখন আমার মা খুব ছোট ছিল, কিছুই বুঝতেন না, এইসব কথা আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন শুনছিলাম নানির কাছ থেকে। যখন এসব কথা রাত্রে নানী শুয়ে শুয়ে বলতেন, তখনো চোখ দিয়ে কান্না বেয়ে পড়ত। আমিরজান বেওয়া ২০০৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

তথ্যদানকারী : মৃত আমিরজান বেওয়া

বয়স : ৮০

গ্রাম : কালাকুমা

পো : অন্তর, থানা-নালিতাবাড়ী

জেলা : শেরপুর

সংগ্রহকারী : রুজিনা খাতুন, ১০ শ্রেণী, রোল-১

শাখা-মানবিক

মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়

নবম শ্রেণী

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার কালাকুমা গ্রামে শহীদ ইদ্রিস আলী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্বাস আলী সরকার ও মাতার নাম আমীরজান বেওয়া। পিতা ছিলেন একজন সামান্য কৃষক। কিন্তু তার বড় পরিচয় হলো তিনি বঙ্গমাতার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের পিতা। পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। ইদ্রিস আলী ছিলেন তার ভাই-বোনদের

মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনি প্রায় খুদে লড়াকু সৈনিক রূপে ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ছদ্মবেশে তার মা-বাবাকে দেখতে আসতেন। পাকিস্তানিরা যখন তাদের এলাকায় গুলিবর্ষণ করে এবং জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালায় তখন ইদ্রিস আলীর পিতা কাউকে কিছু না বলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল হয়ত অন্যরকম, যার ফলশ্রুতি ইদ্রিস আলীর পিতা তার দুই মেয়েসহ নদী পার হওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয় এবং ভোগাই নদীতে ভেসে যায় তাদের লাশ। কারণ সেদিন কেউ ছিল না তাদেরকে রক্ষা করার জন্য, কেউ পারল না তার মৃতদেহ কবর পর্যন্ত দিতে। ইদ্রিস আলী যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি খুব কান্নাকাটি শুরু করেন। তার সাথীরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে শক্ত হতে বলে। কিন্তু তাকে কেউ ভোলাতে পারেনি বাবা হারানোর তীব্র প্রতিশোধের কথা, এমনকি মৃত্যুর ভয়ও। কারণ বাবার প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তাই তিনি প্রতিশোধের নেশায় মরিয়া হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েন। তিনি বুঝতে পারলেন তার মৃত্যু অনিবার্য এবং মর্মান্তিক। তার সাথে ছিল একটি গ্রেনেড। তিনি গ্রেনেড ফুটিয়ে দেন এবং নিজেসহ কয়েকজন শত্রু সৈন্য নিয়ে মারা যান। তার মৃত্যুকে মৃত্যু বললে ভুল হবে- তিনি অমর, শহীদ বাঙালিদের নয়নের মনি। সেদিন বাংলাদেশ হারায় এক অকুতোভয় সৈনিককে, আজ বাংলার পতাকা দেখলে মনে পড়ে শহীদ ইদ্রিস আলীর কথা। দেশমুক্তির এক অন্তিম মুহূর্তে আগমন ঘটেছিল ইদ্রিসের। বাংলাদেশে যতদিন পদ্মা-মেঘনা থাকবে ততদিন বাংলার মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে শহীদ ইদ্রিস আলীকে।

তথ্য সংগ্রহকারী : মো : খলিলুর রহমান
মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়
৯ম শ্রেণী, রোল-০১
নাকুগাঁও, নলিতাবাড়ী, শেরপুর
বয়স-১৪ বছর

তথ্য প্রদানকারী
নাম : মো : রুস্তম আলী
গ্রাম+পো : অন্তর
বয়স : ৭০ বছর
থানা : নালিতাবাড়ী
জেলা : শেরপুর

অষ্টম শ্রেণী

শহীদ ইদ্রিসের পরিবারে মোট এগার জন সদস্য। তাদের মধ্যে চার ভাই ও পাঁচ বোন। তার পিতার নাম আব্বাস আলী সরকার এবং মায়ের নাম আমীরজান বেওয়া। তাদের জীবনটা খুব সুখে শান্তিতে ভরপুর ছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কালবৈশাখী ঝড় এলো যে ঝড়ে পরিবারের অনেক লোক মারা গেল। শুধু বেঁচে রইল আমীরজান এবং তিন ভাই তিন বোন। ইদ্রিস মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করার জন্য একটি দল গঠন করলেন। তারপর তিনি মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করলেন। দেশে বেধে গেল তুমুল গোলমাল, সকালে খবর এলো গাছের একটি পাতাও নাকি থাকবে না। এই ভয়ে ইদ্রিসের পরিবারও নিজ গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী ভারতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করল। প্রথমে তারা ভারতে যাওয়ার জন্য নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিলো। যখন তারা ঠিক নদীর মাঝখানে আসল তখনই তার পিতার বুকে গুলি লাগল, তিনি পানিতে পড়ে গেলেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সেই দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৮শে মে। আব্বাস সরকারের সাথে দুই মেয়ে ছিল। সেই দুই মেয়েও সেখানে মারা যায়। স্বামী-মেয়ে মারা যাওয়ার পর আমীরজান পাগলের মতো হয়ে যান। এবং তিনি তখন কোনো কথা বলতে পারলেন না। শুধু চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগল। বাবা এবং বোনের মৃত্যুর কথা শুনে ইদ্রিস বলল, আমি বেঁচে থাকতে আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমি এ জীবন রাখব না। ইদ্রিসও মুক্তিযুদ্ধে মারা যান। সবাই মারা যাওয়ার পর তাদের জীবনটা খুব দুঃখ-কষ্টে কাটে। আমিরজান বেওয়ার ছেলে মেয়েরা যখন ভাতের জন্য কান্না শুরু করে তখনই তার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ভাত দিতে না পেরে অন্যের কাছ থেকে ভাতের ফেন এনে দিয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে আমীরজানের চোখে জল ছিল না। এবং শেষে তার চোখে ঘা হয়ে যায়। আমীরজান বেওয়া ২০০৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আর কি লিখব। এখানেই শেষ করছি।

তথ্যপ্রদানকারী
মো : ইদ্রিস আলী, বয়স-৪৫
গ্রাম : কালাকুমা

পো : অন্তর

তথ্য সংগ্রহকারী

সাকিলা আক্তার

অষ্টম শ্রেণী, ক্রমিক নং-১

মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়, নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর

সপ্তম শ্রেণী

শহীদ ইদ্রিস আলী ও আমিরজান বেওয়ার পরিচয়

শহীদ ইদ্রিস আলীর বাবার নাম আব্বাছ আলী সরকার, মাতা আমিরজান বেওয়া, গ্রাম-কালাকুমা, ডাকঘর-তন্তর, উপজেলা নালিতাবাড়ী, জেলা-শেরপুর। তাঁরা চার ভাই, পাঁচ বোন। ভাইদের মধ্যে ইদ্রিস আলী প্রথম। ১৯৭১ সালে ইদ্রিস আলী দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। দেশে তখন প্রচণ্ড গণ্ডগোল। হঠাৎ একদিন খবর হলো পাক বাহিনীরা গাছের একটি পাতাও রাখবে না। এই খবর শুনে ইদ্রিস আলীর বাবা তার পরিবারবর্গ নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। ভারতে যাওয়ার পথে ভোগাই নদী পাড়ি দিতে হয়। ইদ্রিস আলীর পিতা তার এক মেয়েকে পিঠে, এক মেয়েকে ডান হাতে তুলে নেন এবং বাম হাতের সাথে আমিরজান। তারা যখন নদীর ঠিক মাঝখানে এলো তখনই পাকবাহিনীর একটি গুলি লেগে তার পিতার মাথার খুলিটা খসে নদীর স্রোতের সাথে ভেসে গেল। কাঁধে চড়া মেয়েটিও গুলি লেগে পানিতে পড়ে গেল এবং তার আর এক মেয়ের বুকে গুলি লাগে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সেও মারা যায়। বাবা আর বোনের মৃত্যুর কথা শুনে ইদ্রিস পাগলের মতো হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ইদ্রিস আলী পাক সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। তখন তার কাছে ছিল একটি গ্রেনেড। ইদ্রিস বুঝতে পারল তার মৃত্যু অনিবার্য, ইদ্রিস আলী তখন পাকবাহিনীর উদ্দেশে গ্রেনেডটি নিক্ষেপ করে নিজে ও বেশ কয়েকজন পাকবাহিনীসহ শাহাদাৎ বরণ করেন। তিন ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে আমিরজান বেওয়া ইতিহাস হয়ে বেঁচে ছিলেন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

তথ্য সংগ্রহকারী : মিতু ইসলাম

৭ম শ্রেণী, রোল-০১

মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়

নালিতাবাড়ি, শেরপুর

একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি ছিলেন ইদ্রিস আলীর সঙ্গী তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত

নাম : মো : সুরুজ আলী

গ্রাম : হাতিপাগার

নালিতাবাড়ী, শেরপুর

বয়স-৫৫